কালীপূজা ও দেওয়ালি

কামিনীকুমার রায়

দুর্গাপূজার পর কার্তিকী অমাবস্যা একটি সর্বভারতীয় উৎসবের দিন। এই দিনে ভারতের সর্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান আচরিত হইতে দেখা যায়। রাত্রিতে দীপদান—গৃহে মন্দিরে, দেবতা-স্থানে, বৃক্ষমূলে, নদীকূলে, পথে-প্রান্তরে, আকাশে দীপদান এই উৎসবের একটি সর্বজনীন প্রধান কৃত্য। বাঙালি, বিহারী, আসামী, মাদ্রাজী, মাড়োয়ারি, সকলেই পরম নিষ্ঠার সহিত ইহা পালন করিয়া থাকে। এই সর্বজনাচরিত অনুষ্ঠান দীপদান হইতেই কার্তিকের অমাবস্যা 'দীপান্বিতা অমাবস্যা' এবং এই অমাবস্যার ভারতব্যাপী যে উৎসব হয়, তাহার নাম দীপালী বা দেওয়ালি।

কালীপূজা

দেওয়ালি সর্বভারতীয় উৎসব হইলেও এই উৎসবে সর্বত্র একই কার্যসূচি অনুসৃত হয় না। বাঙালির দেওয়ালি প্রধানত কালীপূজা-কেন্দ্রিক। বাঙালির মাতৃদেবতার মধ্যে ইনিই সর্বপ্রধান। ইনি একাধারে সুন্দর ও ভৈরব; যেমন ইহার এক হাতে খড়্গ আর এক হাতে অসুর-মুণ্ড, তেমনি আবার এক হাতে বর, অপর হাতে অভয়; ইনি ভীষণং ভীষণাং, আবার আশ্রিত সন্তানের স্নেহময়ী জননী; ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী, ইনিই জগদীশ্বরী। অতীব দুর্জ্ঞেয় এই কালীতত্ত্ব। তন্ত্রে পুরাণে ইহাকে অতি উচ্চে সাধারণের নাগালের বাহিরে স্থান দিয়াছে। ইহার পূজাপদ্ধতিও অত্যন্ত জটিল। জানি না কোন্ সাধকের ধ্যানলব্ধ অথবা কল্পনাপ্রসূত এই কালীমূর্তি। ঋষি বঙ্কিম একদিন এই কালী-প্রতিমার মধ্যে হৃতসর্বস্বা বঙ্গজননীর মূর্তিটিই যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আনন্দমঠে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কালীমূর্তি দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখ, মা যা হইয়াছেন। ...কালী অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালীমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!" কিন্তু তিনি আশা পরিত্যাগ করেন নাই, সন্তান যেদিন মাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিবে দেশ আবার সেদিন ধন-ধান্যে, ষড়ৈশ্বর্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ, সর্বানন্দ (ত্রিপুরা) এই নগ্নিকার পদতলে বসিয়াই অনন্তরূপিণী জগদীশ্বরীকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সাধনা, গান, কথামৃত এই মহাদেবীকে ঊর্ধলোক হইতে নামাইয়া গণদেবতা করিয়া তুলিয়াছে; কালীপূজা আজ আর কেবল সাধক বা উচ্চশ্রেণীর বাঙালি গৃহস্থের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। সর্বত্র সর্বশ্রেণীর বাঙালির মধ্যে তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কালী নামের মধ্যে বাঙালি তাহার হারানো সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছে, কালীমূর্তির মধ্যে সে তাহার প্রকৃত মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। গৃহী, সন্ন্যাসী, দস্যুতস্কর, পাপী-তাপী, চাকুরে-ব্যবসায়ী সকলেরই তিনি 'মা' বরাভয়দাত্রী। বাঙালি

মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, মহাশক্তি মহাকালীর পূজার একদিন তাহার সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া সংসারে-সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হইবে।

মনে হয়, সমস্ত বাংলাদেশটাই যেন কালীক্ষেত্র। যেদিকে চাই কেবলই কালীমন্দির, কালীপূজা। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতার বুকে ৫১ পীঠের শ্রেষ্ঠ পীঠ কালীঘাট। লক্ষপতি হইতে পথের ভিখারি পর্যন্ত কে না সেখানে দিনান্তে, মাসান্তে কিংবা বৎসরান্তে একবার দেবীর কৃপালাভের জন্য ছুটিয়া যায়? ঠনঠনিয়া কালীবাড়িও কলিকাতার কেন্দ্রস্থলেই অবস্থিত। কলিকাতা হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়া উত্তর দিকে চলিলে মাত্র কয়েক ক্রোশের মধ্যে আরও কত মাতৃমন্দিরই না চোখে পড়ে! ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির, মূলাযোড়ে কলিকাতার ঠাকুর-বংশের গোপীমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির, শেওড়াফুলিতে তথাকার রাজাদের দ্বারা স্থাপিত নিস্তারিণীর মন্দির, বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব প্রতিষ্ঠিত ত্রয়োদশ-চূড় হংসেশ্বরী মন্দির—এইরূপ কত নাম করা যায়। গঙ্গার তীর ছাড়িয়া অন্যত্র দৃষ্টিপাত করি, সেখানেও প্রতি সমৃদ্ধ জনপদ ও নগর-বন্দরের জাগ্রত দেবতা—অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী—'সিদ্ধেশ্বরী', 'আনন্দময়ী', 'ঢাকেশ্বরী', 'দয়াময়ী' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিতা এবং পূজিতা। ঝোপ-জঙ্গলে কত 'ডাকাতে কালী'র থান দেখা যায়। যখনই যিনি অর্থ-বিত্ত, সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছেন, পুণ্য অর্জন করিতে চাহিয়াছেন, তখনই তাঁহার মনে জাগিয়াছে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা। তাই দিনে দিনে বাংলার মাটিতে মায়ের মন্দির বাড়িয়াই গিয়াছে। পল্লীবাংলায় কালীপূজা না করিয়া কিংবা কালীমন্দিরে ভোগ না দিয়া বিবাহাদি কোনও শুভকার্য অনুষ্ঠিত হয় না। শুধু তাহাই নহে, দুর্ভিক্ষে-মহামারীতে, অশান্তি-উপদ্রবে দুস্থ বাঙালির রক্ষাকর্ত্রী মা রক্ষাকালী। বিশেষ বিশেষ দিনে, শনি-মঙ্গলবারে, অমাবস্যায় মহা ঘটা করিয়া ইঁহার পূজা করা হয়। বাঙালি চিত্তের উপরও ইঁহার প্রভাব অপরিসীম। এমনকি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেবের সাধনপীঠ নবদ্বীপেও শক্তিদেবীদের তথা মহাদেবী কালীর পূর্ণ আধিপত্য। তাই দেখি, বৈষ্ণবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্ব 'রাসযাত্রা'র দিনে সেখানে চলে মহাড়ম্বরে কালীপূজা। কী বিশাল সুন্দর সে সকল কালীমূর্তি। ব্যাদরাপাড়ায় 'শবশিবা' মূর্তি ও চারিচারা বাজারের 'ভদ্রকালী' মূর্তি বিশ হাত পর্যন্ত উঁচু হয়। নবদ্বীপে এই দিনে প্রায় তিন শত কালী ও অন্যান্য শক্তিদেবীর পূজা হইয়া থাকে।

কার্তিকী অমাবস্যার গভীর নিশীথে শ্যামা মায়ের পূজা—বাঙালির দেওয়ালি উৎসবের ইহাই বড়ো কথা। ছোটো কথাও অনেক আছে। দেওয়ালি একটি অনুষ্ঠান-বহুল উৎসব।

লক্ষ্মীপূজা

লোকাচার হিসাবে কালীপূজার রাত্রিতে—সন্ধ্যায় বাংলার বহু স্থানে—বিশেষত ভাগীরথী অঞ্চলে এবং যশোহর ও খুলনা জেলায় গৃহিণীরা লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকেন। গোবর দিয়া অলক্ষ্মীর মূর্তি এবং পিটুলি দিয়া লক্ষ্মী, কুবের ও নারায়ণের মূর্তি গড়া হয়।

অলক্ষ্মীর মূর্তিটি কলার খোল বা পেটোতে রাখিয়া প্রথমে তাঁহার পূজা ও ধ্যান করা হয়। অলক্ষ্মী কৃষ্ণবর্ণা, ক্রোধী; এলোকেশী; তাঁহার এক হাতে কুলা, অন্য হাতে সম্মার্জনী, তিনি গর্দভারূঢ়া—প্রায় শীতলাদেবীরই অনুরূপ। পূজান্তে ছেলেমেয়েরা কুলা পিটাইতে পিটাইতে অলক্ষ্মীর মূর্তিটি ঘরের বাহিরে লইয়া যায় এবং চৌমাথায় ফেলিয়া দিয়া বলে, 'লক্ষ্মী ঘরে আয়, অলক্ষ্মী দূরে যা।' এইরূপে 'অলক্ষ্মী-বিদায়'-এর পর যথারীতি লক্ষ্মীপূজা করা হয়। লক্ষ্মীমূর্তির দুই পার্শ্বে কুবেরের ধনভাণ্ডার ও নারায়ণের মূর্তিগুলি বসানো হয়। পিটুলির মূর্তি ছাড়াও কিংবা পিটুলির মূর্তি না দিয়া অনেকে মাটির প্রতিমা আনেন। পূজা স্থানে একটি ঘৃত-প্রদীপ ও বহু তৈল প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। ঘৃত-প্রদীপটি সারা রাত্রি রক্ষা করা হয়। এতদ্ব্যতীত এইদিন পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য স্থানে ব্যাপকভাবে দীপদানের কথা পরে বলিতেছি।

বাজী পোড়ানো—বিচিত্র রকমের বাজী পোড়ানো, পট্‌কা ফাটানো বাঙালির দেওয়ালি উৎসবের আর একটি প্রধান অঙ্গ। প্রতি বৎসর কত সহস্র টাকা যে এই উপলক্ষে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ নয়। এইক্ষেত্রে বাঙালি অনেক সময় এমন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে যে, তাহাতে পথচারী এবং পাড়া প্রতিবেশীর অশেষ ক্ষতি সাধিত হয় এবং গভর্নমেন্টকে বাধ্য হইয়া নানা বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিতে হয়।

দীপান্বিতা অমাবস্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দুদের অনেকেই পরলোকগত পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন এবং সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে দীপ ও উল্কাদান করেন। তাঁহাদের মতে দীপদানের মূল উদ্দেশ্য পিতৃপুরুষগণকে যমলোক হইতে দেবলোকে যাইবার পথে সহায়তা করা।

হিন্দুস্থানীদের দেওয়ালি

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দেওয়ালি উৎসব প্রধানত লক্ষ্মীপূজাকে কেন্দ্র করিয়া। বাঙালিরা যে উদ্দেশ্যে এই পূজা করে, হিন্দুস্থানীরাও সেই উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে। কিন্তু আচার-পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে লক্ষ্মীপূজা করেন গৃহকর্ত্রীরা, উত্তর ভারতে করেন গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রী উভয়েই। অমাবস্যার সন্ধ্যায় তাঁহারা স্নান করিয়া শুদ্ধ বসনে শুদ্ধ মনে একটি আসনে লক্ষ্মীর মূর্তি এবং উহার দুই পার্শ্বে কুবের, গণেশ, শিব, পার্বতী, রাম, সীতা প্রভৃতির মূর্তি স্থাপন করেন এব ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া দিয়া ষোড়শোপচারে লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করেন। লক্ষ্মীর নিকট প্রার্থনা করেন অটুট স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ আয়ু, কুবেরের নিকট করেন ধনৈশ্বর্য। শুধু ভোগ নৈবেদ্যই নহে, পূজা স্থানে কিঞ্চিৎ ধনরত্ন, খাতাপত্র, দোয়াত-কলম, একটা পাত্রে করিয়া ধান, গম, তৌলদণ্ড ইত্যাদিও সাজাইয়া দেওয়া হয়। অনেকে সিন্ধুকের গায়ে, দেওয়ালে, কপাটে সিন্দূর দ্বারা স্বস্তিক-চিহ্ন আঁকেন এবং মনে মনে উহাকে পূজা করেন। সন্ধ্যা হইতেই ঘরে একটি ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয়। এই প্রদীপ লক্ষ্মীর প্রতীক, সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া যথারীতি উহাকেও পূজা করা

হয়। লোকমত এই যে, দেওয়ালির রাত্রিতে সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত যাহার গৃহে দীপ জ্বলে, লক্ষ্মী তাহার গৃহে স্থায়ী হন এবং গৃহস্বামী কখনও দারিদ্র-কষ্ট ভোগ করেন না। প্রদীপের তৈল শরীরে মালিশ করিলে স্বাস্থ্য ভালো হয় এবং বৃদ্ধি পায়, এইরূপও শুনা যায়। দীপদানের ব্যাপারে মাড়োয়ারি, বিহারী, বোম্বাইবাসী প্রভৃতিরা যথেষ্ট উৎসাহ দেখান এবং অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহাদের মতে দীপদান মহাপুণ্যময় অনুষ্ঠান। এই কৃত্যের ভিতর দিয়া দাতা অতুল সম্পদ ও সম্পত্তির অধিকারী হন এবং অন্তে মোক্ষধাম লাভ করেন। দ্যূতক্রীড়া বা জুয়া খেলা হিন্দুস্থানীদের দেওয়ালির আর একটি অঙ্গ। লোকবিশ্বাস এই যে, রাত্রিতে লক্ষ্মী ঘরে ঘরে উঁকি দিয়া যান—কে জাগে, কে ঘুমায়। নিদ্রিত ব্যক্তির গৃহ হইতে তিনি নিঃশব্দে চলিয়া যান এবং যে জাগিয়া আছে তাহার গৃহে দিয়া অবস্থান করেন। তাই গৃহীরা দেওয়ালির সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিতে চেষ্টা করে এবং অনেকে দ্যূতক্রীড়ার ভিতর দিয়া এই চেষ্টায় সফল হইতে চায়। বাঙালিদের মধ্যেও প্রায় একইরূপ বিশ্বাস প্রবল দেখা যায়। লক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে, অমাবস্যার রাত্রিতে প্রদীপের আলো দেখিয়া লক্ষ্মী আসিয়া ঘরে উঠেন। অন্ধকারে পাছে তিনি ফিরিয়া যান তাই গৃহিণী আলো জ্বালিয়া সারা রাত্রি দরজার কাছে বসিয়া থাকেন।

ব্যবসায়ীদের অনেকে এই লক্ষ্মীপূজার পরদিন হইতে তাঁহাদের বৎসর ধরেন এবং নূতন খাতা করেন। বাঙালিরা দুর্গাপূজার সময়ে যেমন নূতন বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়, বিজয়ার দিনে আত্মীয়-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে মিষ্টিমুখ করায়, সাদর সম্ভাষণ জানায়, অবাঙালিরা দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজার দিনে সেইরূপ করিয়া থাকে। তখন তাহাদের ঘর-দুয়ার, উঠান-আঙিনা, আসবাবপত্র, তৈজস বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

গো-অর্চনা

গো-অর্চনা এবং গোরুর সেবা-যত্ন উত্তর-ভারতীয় দেওয়ালির আর একটি প্রধান অঙ্গ। পল্লীবাসীরা সেদিন হালচাষ বন্ধ রাখে এবং গো-মহিষাদিকে সর্বপ্রকার পরিশ্রমের কাজ হইতে মুক্তি দেয়। সকাল হইতেই সকলে তাহাদের গোরু-বাছুর লইয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে নিকটবর্তী কোনও বৃহৎ জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হয় এবং সেগুলিকে জলে নামাইয়া ডলিয়া-মলিয়া স্নান করায়। স্নানের শেষে শোভাযাত্রা করিয়া বাড়ি ফিরে এবং একে একে প্রত্যেক গোরুর শিং-এ তেল-ঘি মাখাইয়া দেয়; আবির কিংবা অন্য রং গুলিয়া সর্বাঙ্গে ছাপ দেয় এবং উত্তম ঘাস-খড়-ভূষি-খৈল খাবার দিয়া প্রণাম করে। বাংলাদেশেও এইরূপ গো-অর্চনার (বাঁধনা, গঠপূজা) রীতি আছে।

দক্ষিণ ভারতের দেওয়ালি

দক্ষিণ-ভারতের দেওয়ালি ত্রয়োদশী হইতে আরম্ভ হয় এবং অমাবস্যা পর্যন্ত তিন দিন ধরিয়া তাহারা দীপদান করে। পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়; বালক-বালিকারা নূতন কাপড় পরে, বাজী পোড়ায়; ব্যবসায়ীরা ধনরত্ন ও খাতাপত্রের

পূজা করে; সকলে শুদ্ধ মনে, শুদ্ধ বসনে এই কয়দিন অতিবাহিত করে। প্রথম দিনের উৎসবকে 'ধন ত্রয়োদশী' বলা হয়; সেদিন ধনরত্ন ও গৃহের যাবতীয় দ্রব্যাদির পূজা এবং উহাদের বৃদ্ধি কামনা করা হয়। ইহা লক্ষ্মীপূজারই প্রকার-ভেদ। দ্বিতীয় দিনের উৎসবকে 'নরক চতুর্দশী' বলা হয়। এইদিন মাদ্রাজীরা সাজ-সজ্জায় এবং প্রসাধনে বিশেষ মনোযোগী হয়। অমাবস্যায়ও অনুরূপ অনুষ্ঠানই চলে। তবে সেদিন বিশেষভাবে বহ্নিপূজাও করা হয়।

দীপদান

আর্য ভারতের অপর বহু প্রধান উৎসবের ন্যায় দীপালীও একটি মিশ্র উৎসব; কালে কালে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তিগত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ইহার সহিত সংযোজিত হইয়া ইহাকে সর্বজনীন উৎসবে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু উৎসবের অঙ্গীভূত অনুষ্ঠানগুলির নামরূপ, সংখ্যা ও উদ্‌যাপন-প্রণালী সকল রাজ্যে এক নহে। বাংলার দীপালীর প্রধান কথা কালীপূজা, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের লক্ষ্মীপূজা এবং দক্ষিণ ভারতের অভ্যঙ্গ-স্নান ও নববস্ত্র পরিধান, নেপালের গো-অর্চনা। রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশে এই উৎসবের সময়ে দ্যূতক্রীড়া অবশ্য করণীয় ধর্মানুষ্ঠান; সেখানকার অধিবাসীদের তখন ধাতু-নির্মিত কোনও না কোনও পাত্র ক্রয় করিতেই হয়; কিন্তু বাঙালির দীপালীর ওইগুলি অঙ্গ নয়। আবার দক্ষিণ-ভারতে এই সময়ে নূতন জামাতাকে আদর-আপ্যায়ন করিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, অন্যত্র তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতার মধ্যেও যে অনুষ্ঠানটি ভারতের এবং ভারতের বাহিরের কোটি কোটি মানুষকে একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে এবং দীপালী উৎসবটিকে সর্বভারতীয় উৎসবের গৌরব দান করিয়াছে, তাহা হইতেছে দীপদান, সারিবদ্ধভাবে কার্তিকী অমাবস্যার রাত্রিতে দীপদান। উৎসবের কার্যসূচিতে রাজ্যে রাজ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলেও এই একটি ব্যাপার সর্বজনগৃহীত সর্বজনীন; দীপদানে কাহারও দ্বিধা নাই। দীপদানের এই বাধ্যকতা হইতেই যে সমগ্র উৎসবটির দীপাবলী, দীপালী বা দেওয়ালি নামকরণ হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে বাজি-বারুদ পোড়ানোও দীপালী উৎসবের আর একটি সর্বজনীন কৃত্য হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে ভারতে মুসলমান যুগের সংযোজন বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু দীপালীর রাত্রিতে সকল দীপদান করিলেও ইহার সূচনাকাল এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে মতভেদ আছে। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পর আমাদের পিতৃপুরুষগণ দেবলোকে চলিয়া যান, দেবলোক আলোকময়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না; অনেককে কর্মফলের জন্য অন্ধকারে, অন্ধকারময় যমলোকে অবস্থান করিতে হয়। মহালয়া ও দীপান্বিতা অমাবস্যায় দীপ ও উল্কাদান করিলে, সেই আলোতে পথ দেখিয়া তাঁহারা যমলোক হইতে ঊর্ধলোকে, দেবলোকে চলিয়া যান। এই দীপদান ও উল্কাদানের মন্ত্রগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী।

উজ্জ্বলজ্যোতিষা দগ্ধাস্তে যান্তু পরমাং গতিম্।।
যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষাবর্ত্ম প্রপশ্যন্তু ব্রজন্তু তে।।'

মহাভারতের অনুশাসনপর্বে দীপদানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং নির্দেশ দান করা হইয়াছে : 'দীপ উর্ধ্বগামী এবং তেজঃপদার্থ, অতএব দীপদান করিলে মনুষ্যের তেজোবৃদ্ধি ও উর্ধ্বগতি লাভ হইয়া থাকে। অন্ধতামিশ্র নরক নিবারণের নিমিত্ত উত্তরায়ণের রজনীতে দীপদান করা লোকের অবশ্য কর্তব্য। দেবগণ তেজস্বী, প্রভাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকারস্বরূপ। অতএব দেবগণের গুণসম্পন্ন দীপদান করিয়া তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্তব্য। * * * প্রতিদিন দীপদাতা মহাত্মারা ইহলোকে কুলপ্রকাশক ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চরমে চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্মানদিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।' (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)

লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে দেওয়ালির রাত্রিতে গৃহে, গৃহদ্বারে, প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে, ঘাটে, পথে সারি সারি অসংখ্য দীপ জ্বালানো হয়। তদুপরি পূজার স্থানে সারারাত্রি একটি ঘৃত প্রদীপও জ্বালাইয়া রাখা হয় এবং দেখিতে হয় যাহাতে উহা নিভিয়া না যায়। লোকমত এই যে, লক্ষ্মী যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন, তেমনি ভালোবাসেন আলো। দেওয়ালির রাত্রিতে তিনি ঘরে ঘরে উঁকি দিয়া যান, দেখেন—কে জাগে, কে ঘুমায়, কাহার গৃহে দীপ জ্বলে। যাহার গৃহে দীপ জ্বলে, লক্ষ্মী নাকি তাহার গৃহেই আসিয়া উঠেন এবং তাহার সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হয়। লক্ষ্মী কখন আসিবেন তাহার স্থিরতা নাই; অন্ধকার দেখিয়া পাছে তিনি ফিরিয়া যান, তাই গৃহিণী সারারাত্রি আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকেন। গৃহের চারিদিকে দীপের মালা সাজাইয়া দেন। লক্ষ্মীর এই আলো-প্রীতির প্রমাণ বাংলার এবং উত্তর ভারতের দুই-একটি বহু প্রচলিত ব্রতকথায়ও আছে।

জৈনদের মতে তাঁহাদের ধর্মগুরু মহাবীর এক কার্তিকী অমাবস্যার রাত্রিতে পরিনির্বাণ লাভ করেন। তখন তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ তাঁহার নির্বাণ-স্থান পাবা নগরীতে ব্যাপকভাবে এক আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করিয়া সকলকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে, প্রভুর নির্বাণ-প্রাপ্তি ঘটিলেও তাঁহার জ্ঞানের আলোক পৃথিবীতে চিরকাল এই আলোকমালার মতোই অনির্বাণ থাকিবে। ইহার পর হইতেই নাকি তীর্থঙ্কর মহাবীরের প্রতি মৃত্যুবার্ষিকীতে অর্থাৎ কার্তিকের অমাবস্যাতে গৃহে গৃহে, গৃহের বাহিরে সর্বত্র দীপদানের প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে।

শিখ সম্প্রদায় লক্ষ্মীপূজা বা কালীপূজা করেন না, কিন্তু দেওয়ালির রাত্রিতে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ও তৎসংলগ্ন সৌধসমূহে দীপদানের যে সমারোহ হয়, সমগ্র ভারতে তাহার তুলনা নাই। সে দীপোৎসব দেখিবার জন্য সমস্ত রাজ্য যেন ভাঙিয়া পড়ে। শিখদের এই দীপদান প্রথার উৎপত্তির মূলে কেহ কেহ দুই-একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেন। শিখদের ষষ্ঠগুরু হরগোবিন্দ শিখদিগকে সশস্ত্র বিদ্রোহে পথে উদ্দীপ্ত করেন। শিখদের ষষ্ঠগুরু হরগোবিন্দ শিখদিগকে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে উদ্দীপ্ত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর

ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠেন এবং গুরুজীকে তাঁহার প্রধান অনুচরবর্গের সহিত গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করিয়া রাখেন। ইহার ফলে পারিষদবর্গের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং রাজ্যব্যাপী ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সম্রাট তখন বাধ্য হইয়া গুরু হরগোবিন্দকে তাঁহার অনুচরবর্গসহ মুক্তি দেন। মুক্তি পাইয়া তিনি দেওয়ালির দিনে দরবার সাহেবে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, ব্যাপক আলোকসজ্জা সেই সংবর্ধনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক বলেন, দেওয়ালির রাত্রিতে স্বর্ণমন্দিরের আলোকসজ্জার ভিতর দিয়া গুরু হরগোবিন্দ সিংহের বিজয় সংবর্ধনার স্মৃতি পূজাই করা হইয়া থাকে। তাঁহারা আরও বলেন, শিখদের পঞ্চমগুরু অর্জুনের সময় এক দেওয়ালির দিনেই অমৃতসরের দরবার সাহেব গুরুদ্বারের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়াছিল, শিখদের এই দীপোৎসব গুরুদ্বারের সেই প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবও ঘটে।

পাঞ্জাবের স্বামী রামতীর্থের অনুগামীরাও আশ্রমে, মিশনে, দেওয়ালির দিনে দীপদানের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের মতে ইহা স্বামীজীর স্মৃতিপূজারই একটি অঙ্গ। কথিত হয়, দেওয়ালির দিনেই স্বামী রামতীর্থের জন্ম, দেওয়ালির দিনেই তাঁহার মৃত্যু এবং দেওয়ালির দিনেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উত্তর ভারতের এই জনশ্রুতি প্রবল যে, দশেরাতে (দশরা) রাম রাবণকে বধ করেন এবং পরবর্তী অমাবস্যাতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। সেই উপলক্ষে রাজ্যব্যাপী আলোকসজ্জার যে সমারোহ হইয়াছিল, দেওয়ালির আলোকমালা তাহারই স্মৃতি বহন করে। রাজস্থানে অনেকে এই দিনটিকে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের দিন বলিয়াও মনে করেন। আবার কাহারও মতে এই দিনটিতে প্রবলপ্রতাপ বিক্রমাদিত্য হুনদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দেশকে নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন, সেই হইতেই বিক্রম সংবৎ আরম্ভ হয়।

দক্ষিণ ভারতে দীপান্বিতা অমাবস্যার পূর্ব দিনকে বলা হয় 'নরক চতুর্দশী'; জনশ্রুতি এই যে, প্রাগজ্যোতিষে রাজা নরকাসুর এক সময়ে প্রবল অত্যাচারী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার অন্তঃপুরে ক্রমে ষোলো হাজার নারীকে বন্দি করিয়া রাখেন। তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া অবশেষে সকলে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সহায়তায় দীপাবলীর পূর্বরাত্রিতে নরকাসুরকে বধ করেন এবং সমস্ত বন্দিনীকে মুক্তি দেন। বন্দিনীরা দীর্ঘকাল মলিন বেশে, রুক্ষ কেশে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা মুক্তি পাইয়া অভ্যঙ্গ-স্নান প্রসাধন করে ও নূতন বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া দেশবাসী সকলের সঙ্গে আনন্দ উৎসবে যোগ দেয়। অনেকে বলেন, 'নরক চতুর্দশী'তে আনুষ্ঠানিকভাবে যে চৌদ্দোটি দীপ জ্বালানো হয়, তাহা নরকাসুরের উপর কৃষ্ণ বিজয়ের স্মৃতিই বহন করে।

মহারাষ্ট্রে দেওয়ালির পর দিন প্রতিপদে দৈত্যরাজ বলির পূজা করা হয়। রাজা বলির একটি ছোটো মূর্তি তৈয়ার করিয়া উহার সম্মুখে ফলমূল দিয়া প্রার্থনা করা হয়—অভাব, অশান্তি দূর হউক, পৃথিবীতে আবার বলির রাজত্ব ফিরিয়া আসুক। কথিত হয়, তাঁহার

রাজত্বে প্রজারা বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইতেছিল। পাছে তিনি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসেন এই ভয়ে দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু বামন অবতারে বলিকে কৌশলে রাজ্যচ্যুত করিয়া পাতালে প্রেরণ করেন। কিন্তু শেষে তাঁহার অনবদ্য দানে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পুরষ্কারস্বরূপ তাঁহাকে প্রতি বৎসর একটি দিনের (প্রতিপদ তিথিতে) জন্য মর্ত্যে আসিতে অনুমতি দেন। কেহ কেহ বলেন, মারাঠাদের দেওয়ালির আলোকসজ্জা যুগপৎ বিষ্ণুর বিজয় এবং বলির পুরনাগমন-সংবর্ধনারই ইঙ্গিত বহন করে।

ভারতের এই দীপোৎসব যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, নানা সূত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের 'নাগনম' নাটকে দীপাবলীর উল্লেখ আছে। আলবেরুণী গজনীর মামুদের সঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে আসেন। তিনি তাঁহার লিখিত বিবরণীতে দেওয়ালিতে নববস্ত্র পরিধানের কথা, রাত্রিতে দীপদানের কথা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন, প্রজারা যাহাতে রাজপ্রাসাদের আলোকসজ্জা দেখিতে পারে তদুদ্দেশ্যে মহামতি আকবর ৪০ গজ দীর্ঘ একটি খুঁটির মাথায় দেওয়ালির রাত্রিতে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতেন। বরোদায় যাদুঘরে সেই প্রদীপটি এখনও রক্ষিত আছে। শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাসিকোও আকবরকে এই ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সকল ইউরোপীয় পর্যটক এদেশে আসেন, তাঁহারাও দীপাবলীর বিবিধ অনুষ্ঠানের কথা বিশেষ করিয়া দীপদান, নদীর জলে বাতি ভাসান ইত্যাদির বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই আলোকসজ্জা ইত্যাদির ভিতর দিয়া তাহাদের বিবিধ ধর্মীয় বা জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে। ১৭৪ সাল হইতে ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর ৫ নভেম্বর তারিখে বহ্ন্যুসব, আলোকসজ্জা ও বাজি পোড়ানোর মাধ্যমে Guy Fawkes দিবস পালিত হইয়া আসিতেছে। ফরাসিরা ১৪ জুলাই তারিখটিতে অনুরূপভাবেই তাঁহাদের বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন। চীনাদের Feast of Lanterns উৎসবটি তো অতি সুবিদিত। তাঁহারা তাঁহাদের বৎসরের প্রথম মাসটির মধ্যভাগে (ফেব্রুয়ারি) বাজি পোড়াইয়া, পট্‌কা ফাটাইয়া এবং সর্বত্র দীপাবলীর ব্যবস্থা করিয়া উৎসব পালন করেন। এভাবে জাপানীদের Bon উৎসবের কথাও উল্লেখযোগ্য। জনশ্রুতি এই যে, এই উৎসবের দিনে মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা শ্রদ্ধার্ঘ পাইবার এবং আশীর্বাদ জানাইবার জন্য বংশধরদের গৃহবেদিতে নামিয়া আসে। এই উৎসব উপলক্ষেও আলোকসজ্জার এবং বাজির পোড়ানোর ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়।

অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ভূত প্রেত বা অন্য কোনও অনিষ্টকারী শক্তিকে বিতাড়িত করিবার বা দূরে সরাইয়া রাখিবার আদিম মনোবৃত্তিও যে মানুষকে আলো জ্বালানোর উৎসবে প্রেরণা না দিয়াছে, তাহাও কিন্তু জোর করিয়া বলা যায় না। কেল্ট জাতির লোকেরা এক সময়ে পরী ও ডাইনিদের অনিষ্টকারী শক্তি হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত করিত (Hallowmen Fires), শ্যামদেশে

সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ নিবারণার্থে আকাশ-প্রদীপ দেওয়ার প্রথা আছে। রাজস্থানের ভীলরা অশুভ শক্তির আক্রমণ-উপদ্রব হইতে নিজেদের বাড়িঘর রক্ষার নিমিত্ত দেওয়ালির সারারাত্রি একটি মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। জনশ্রুতি এই, প্রাগদেশের রাজা কোনও জ্যোতিষের নিকট হইতে জানিতে পারেন যে, দেওয়ালির অমাবস্যার রাত্রিতে সর্পাঘাতে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটিবে। এই অপমৃত্যু হইতে পুত্রকে রক্ষার জন্য তিনি তাঁহার প্রাসাদের চতুর্দিকে বিপুল আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেন। পূর্ববঙ্গের এক বিস্তৃতি অঞ্চলে কার্তিক সংক্রান্তির সন্ধ্যায় অমঙ্গলকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে এতটি কুশপুত্তলিকায় আগুন ধরাইয়া বাড়ির আনাচে-কানাচে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বলা হয়—

ভীলা আইয়ে বুড়া যায়,
মশা মাছির মুখ পোড়া যায়,
দো! দো! দো!

অবনীন্দ্রনাথ বলেন, সুদূর Bohemiaতেও এককালে অনুরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। খড়ের একটি মূর্তি পোড়াইয়া ছেলেরা বলিত, আমরা আজ মৃত্যু ও অমঙ্গলকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতেছি। পূর্ব বাংলার পল্লীতে দেওয়ালির সন্ধ্যায় বালিকারা প্যাঁকাটি জ্বালাইয়া ঘরে যায় এবং ছড়া বলে,

জোঁক পোক কি কর
ঘরের তনে নিকল
লক্ষ্মী ঘরে আয়
অলক্ষ্মী দূর' হ'—।

মেদিনীপুর অঞ্চলেও সেদিন প্যাঁকাটিতে আগুন ধরাইয়া অনুরূপ ছড়া বলা হয়;

আলোতে আলোতে এস
অন্ধকারে অন্ধকারে যাও,
আজ এসে কাঁচা খাও,
কাল পাকা খেয়ে বাড়ি যাও।

দীপদান এবং অগ্নি প্রজ্বালনের আর একটি প্রত্যক্ষ ফলের কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে দুর্গাপূজার পর এক শ্রেণীর সবুজ পোকার এত উপদ্রব হয় যে, স্থিরভাবে বসিয়া কোনও কাজ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। দেখা যায়, দীপালীর আলোকসজ্জার পরই উহাদের সেই উপদ্রব কমিয়া আসে, প্রদীপমালার নিচে লক্ষ লক্ষ পোকা মরিয়া পড়িয়া থাকে। কে জানে এককালে এই পোকাবধের সর্ব ভারতীয় অভিযান হইতেই দীপোৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল কি না।

—বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকাচার